৪। সূরা আনফালঃ ৩য় রুকু(২০-২৮)আয়াত

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ٨ : ٢٠

২০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তার কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না.

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ٨ : ٢١

২১. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে, ‘শুনলাম’ আসলে তারা শুনে না।

মুসলিমগণ (তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্বেও) শুধুমাত্র আল্লাহ তা’আলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এ সাহায্য আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর।” এবং তাতে স্থির থাক। কারণ, তোমরা আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ, অসীয়ত, নসীহত সবই শুনতে পাচ্ছ। সুতরাং কুরআন ও সত্যবাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য-বিমুখ হয়ো না। বিমুখ হলে বর্তমান অবস্থা থেকে তোমাদেরকে নিকৃষ্ট অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে। [সা’দী]

আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন কারীমে ও হাদীসে যা হারাম করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা; যা হালাল করেছেন, তা মেনে চলা। যেসব বিষয়ে সতর্ক করেছেন, সেসব বিষয়ে সতর্ক থাকা। যে পথে এবং যেভাবে চলতে আদেশ করেছেন, সেভাবে জীবন যাপন করা। আল্লাহ তাআলার সকল বিধিবিধান জানা ও বোঝা সত্ত্বেও অবাধ্যতা না করা এবং আল্লাহর পথ থেকে সরে না যাওয়া।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَ مَنْ تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ٨ : ٨٠

কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনাকে তো আমরা তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাই নি। সূরা নিসাঃ ৮০

সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা একথাও বলেছেন, তাদের মতো হয়ো না, যারা প্রকৃত শোনার মতো শোনে না। এটা কাফের ও মুনাফিকদের স্বভাব। তারা কেবলই কান দিয়ে শোনে, কিন্তু তা মানে না। বরং আল্লাহর হুকুম-আহকাম শোনার পরেও তাঁর অবাধ্যতা করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। সব জেনেবুঝেও আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে। উক্ত আয়াতে তাদের মতো হতে মুমিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং যদি আমরা শরীয়তের বিধান মেনে না চলি, তাহলে আমাদের স্বভাব মুনাফিকদের মতো হয়ে যাবে।

এব্যাপারে অন্যত্র মুমিনদেরকে আরও বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ

হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বরবাদ করো না। —সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ৩৩

এ আয়াতে মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি আরও বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের আমলকে বরবাদ করো না। অর্থাৎ একদিকে কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা আর অপরদিকে কবিরা গুনাহ করা, আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হওয়া। কোনো ভালো কাজ করার পরে আবার এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যা সেই ভালো কাজকে নষ্ট করে দেয়। অথবা কোনো নেক কাজ এমনভাবে করা, যার ফলে সওয়াব তো হয়ই না; বরং গোনাহের আশঙ্কা রয়ে যায়।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে এমনভাবে, যা সবধরনের শিরক, নেফাক এবং রিয়া (লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানোর উদ্দেশ্য) থেকে মুক্ত। কোনো ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস লালন করা যাবে না। সবসময় নেক কাজ করতে হবে এবং রাসূলের দেখানো পন্থায়ই করতে হবে। আবার নেক কাজ করার পর এমন কিছু করা যাবে না, যা সেই নেক কাজকে বরবাদ করে দেয়। যেমন, দান-সদকা করার পর তা নিয়ে খোঁটা দেওয়া যাবে না। এসব করলে সেই ভালো কাজ বরবাদ হয়ে যাবে।

“বলুন, ‘তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।’ তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনিই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী; আর তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, মূলত: রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৪

যে ব্যক্তি এই কাজটি করবে, সে যেন গুনাহ্ মাফ ও পাপ মোচনের সুসংবাদ গ্রহণ করে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“বলুন, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১

যারা এভাবে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে ও অনুসরণে জীবন কাটাবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কী প্রতিদান দেবেন? কুরআন কারীমে এব্যাপারে বলা হয়েছে–

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا،ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا.

যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা সেইসকল লোকের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহগণের সঙ্গে। কতই না উত্তম সঙ্গী তারা! এটা কেবলই আল্লাহপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব। আর (মানুষের অবস্থাদি সম্পর্কে) পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। —সূরা নিসা (৪) : ৬৯-৭০

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ২২ : ৮

২২. নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম বিচরণশীল জীব হচ্ছে বধির, বোবা, যারা বুঝে না।

এই কথাটিকেই কুরআনের অন্যত্র এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

{لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}

অর্থাৎ, তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন। (সূরা আ' রাফ ১৭৯ আয়াত)

وَ لَوۡ عَلِمَ اللّٰهُ فِیۡهِمۡ خَیۡرًا لَّاَسۡمَعَهُمۡ ؕ وَ لَوۡ اَسۡمَعَهُمۡ لَتَوَلَّوۡا وَّ هُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ৮ : ২৩

২৩. আর আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু আছে জানতেন তবে তিনি তাদেরকে শুনাতেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে শুনালেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিত।

আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক তথা সৎচিন্তা দেখতেন, তবে তাদের বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য দান করতেন কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ তা'আলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে। তাদের এ বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দ্বীনের মধ্যে কোন আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয়ে কোন লক্ষ্যই করেনি। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তাকেই ঈমান থেকে বঞ্চিত করেন যার মধ্যে কোন কল্যাণ অবশিষ্ট নেই, যে পবিত্র হতে চায় না, যার কোন ভাল কথা কোন ফল দেয় না। আর এতে রয়েছে বিরাট হিকমত ও রহস্য। [সা' দী]

আল্লাহ যদি আপনাকে কষ্ট দিতে চান, তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর আল্লাহ যদি আপনার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার মতো কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। [সূরা ইউনুস : ১০৭]

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَجِیۡبُوۡا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوۡلِ اِذَا دَعَاکُمۡ لِمَا یُحۡیِیۡکُمۡ ۚ وَ ৮ : ২৪
اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ یَحُوۡلُ بَیۡنَ الۡمَرۡءِ وَ قَلۡبِهٖ وَ اَنَّهٗۤ اِلَیۡهِ تُحۡشَرُوۡنَ

২৪. হে ঈমানদারগণ রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তারই দিকে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

মানুষের মুনাফেকী আচরণ থেকে বাঁচবার জন্য সবচেয়ে প্রভাবশালী পদ্ধতি যেটি হতে পারে, তা হলো তার মনে দু'টো বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেয়া।

এক, যাবতীয় কর্মকাণ্ড সেই আল্লাহর সাথে জড়িত যিনি মনের অবস্থাও জানেন। মানুষ তার মনে মনে যে সংকল্প পোষণ করে এবং মনের মধ্যে যেসব ইচ্ছা, আশা, আকাংখা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও চিন্তা-ভাবনা লুকিয়ে রাখে, তার যাবতীয় গোপন তথ্য তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট।

দুই, একদিন আল্লাহর সামনে যেতেই হবে। তাঁর হাত থেকে বের হয়ে কেউ কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। এ দু' টি বিশ্বাস যত বেশী শক্তিশালী ও পাকাপোক্ত হবে, ততই মানুষ মুনাফেকী আচরণ থেকে দূরে থাকবে। এ জন্য মুনাফেকী আচরণের বিরুদ্ধে উপদেশ দান প্রসঙ্গে কুরআন এ বিশ্বাস দু' টির উল্লেখ করেছে বারবার।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

(এক) একটি অর্থ হতে পারে যে, যখনই কোন সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেল; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনীমত জ্ঞান কর। কারণ, যে কোন সময় মানুষের রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোন কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে, যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, এ কথা কারোরই জানা নেই যে, কাল কি হবে। পরবর্তীতে ভাল কাজ করতে চাইলে সক্ষম নাও হতে পার। [সা'দী]

(দুই) এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মানুষ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোন বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারো ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়। সে কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দোআ করতেন- অর্থাৎ, হে

অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। [তিরমিযীঃ ২১৪১] [ইবন কাসীর]

(তিন) ইবনে অববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ আল্লাহ কাফেরের ঈমান ও মুমিনের কুফরীর মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। [মুসানদে আহমাদ ৩/১১২ [ইবন কাসীর]

(চার) কেউ কেউ বলেনঃ আয়াতটি যেহেতু বদর যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু তার অর্থ হবে- জেনে রাখ, আল্লাহ তার নেক বান্দাদের ভাগ্যকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করেন। আর কাফেরদের প্রশান্ত অন্তরে অশান্তি ও ভয়ে পরিবর্তন করে দেবেন। আবার তিনি ইচ্ছে করলে মুসলিমদের নিরাপদ অবস্থাকে ভীত অবস্থায় রুপান্তরিত করতে পারেন। [ফাতহুল কাদীর]

একটি হাদীসে নবী (সাঃ) বলেছেন, ‘‘আদম সন্তানের অন্তরসমূহ একটি অন্তরের ন্যায় রহমানের (আল্লাহর) দুই আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি যেভাবে চান তা ঘুরিয়ে থাকেন। তারপর তিনি এই দু’ আ পাঠ করেন। হে অন্তর ফিরানোর মালিক! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও। (মুসলিমঃ তকদীর অধ্যায়) অন্য বর্ণনায় আছে, ‘‘হে হৃদয় পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনে অবিচল রাখ।’ ’ (তিরমিযী, তাকদীর পরিচ্ছেদ)

وَ اتَّقُوۡا فِتۡنَةً لَّا تُصِيۡبَنَّ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡكُمۡ خَآصَّةً ۚ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ ৮ : ২৫

২৫. আর তোমরা ফেৎনা থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম শুধু তাদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

এখানে ’ফিতনা’ দ্বারা একটি সর্বব্যাপী সামাজিক অনাচার বুঝানো হয়েছে। এ অনাচার মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ে মানুষের জীবনে দুর্ভাগ্য ও ধ্বংস ডেকে আনে। শুধুমাত্র যারা গোনাহ করে তারই এ দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের শিকার হয়না বরং এর শিকার তারাও হয় যারা, এ পাপাচারে জর্জরিত সমাজে বসবাস করা বরদাশত করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ ধরে নেয়া যেতে পারে, যখন কোন শহরে ময়লা-আবর্জনা এখানে

সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জমে থাকে তখন তার প্রভাবও থাকে সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় শুধুমাত্র যেসব লোক নিজেদের শরীরে ও ঘরোয়া পরিবেশে ময়লা আবর্জনা ভরে রেখেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যখন সেখানে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ ব্যাপকভাবে জমে উঠতে থাকে এবং সারা শহরে ময়লা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার মতো একটি দলও থাকে না তখন মাটি, পানি ও বাতাসের সর্বত্রই বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে যে মহামারী দেখা দেয় তাতে যারা ময়লা-আবর্জনা ছড়ায়, যারা নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং যারা ময়লা ও আবর্জনাময় পরিবেশে বসবাস করে তারা সবাই আক্রান্ত হয়।

নৈতিক ময়লা ও আবর্জনার বেলায়ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। যদি তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু ব্যক্তির মধ্যে থাকে এবং সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজের প্রতিপত্তির চাপে কোণঠাসা ও নিস্তেজ অবস্থায় থাকে, তাহলে তার ক্ষতিকর প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন সমাজের সামষ্টিক বিবেক দুর্বল হয়ে পড়ে, নৈতিক অনিষ্টগুলোকে দমিয়ে রাখার ক্ষমতা তার থাকে না। সমাজ অঙ্গনে অসৎ, নির্লজ্জ ও দুশ্চরিত্র লোকেরা নিজেদের ভেতরের ময়লাগুলো প্রকাশ্যে উৎক্ষিপ্ত করতে ও ছড়াতে থাকে। সৎলোকেরা নিষ্কর্মা হয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত সততা ও সদগুণাবলী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং সামাজিক ও সামষ্টিক দুষ্কৃতির ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে। তখন সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের ওপর দুর্ভোগ নেমে আসে। এ সময় এমন ব্যাপক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়, যার ফলে বড়-ছোট, সবল-দুর্বল সবাই সমানভাবে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়।

কাজেই আল্লাহর বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, রসূল যে সংস্কার ও হেদায়াতের কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নেমেছেন এবং যে কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন, তার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিক দিয়ে তোমাদের জন্য যথার্থ জীবনের গ্যারান্টি। যদি সাচ্চা দিলে আন্তরিকতা সহকারে তাতে অংশ না নাও এবং সমাজের বুকে যেসব দুস্কৃতি ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকে বরদাশত করতে থাকো তাহলে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেবে। যদিও তোমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থেকে থাকে, যারা কার্যত দুস্কৃতিতে লিপ্ত হয় না এবং দুস্কৃতি ছড়াবার জন্য তাদেরকে দায়ীও করা যায় না বরং নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে তারা সুকৃতির অধিকারী হয়ে থাকে,

তবুও এ ব্যাপক বিপদ তোমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সূরা আ'রাফের ১৬৩-১৬৬ আয়াতে শনিবার ওয়ালাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে এ এক কথাই বলা হয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গীকেই ইসলামের ব্যক্তিচরিত্র ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মৌলিক দৃষ্টিকোণ বলা যেতে পারে।

এখানে নিরপরাধ বলতে সেসব লোককেই বোঝানো হচ্ছে যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও আমর বিল মা' রূফ বর্জন করার পাপে পাপী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন কোন জাতির এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে বাধা দানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয় না, তখন আল্লাহর আযাব সবাইকে ঘিরে ফেলে। [আবু দাউদঃ ৩৭৭৬, ইবন মাজাহঃ ৩৯৯৯]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোন অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবার উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন। [আবু দাউদঃ ৩৭৭৫, তিরমিযীঃ ২০৯৪]

নুমান ইবন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা আল্লাহর কানুনের সীমালংঘনকারী গোনাহগার এবং যারা তাদের দেখেও মৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণীর উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মত যাতে দুটি শ্রেণী রয়েছে এবং নীচের শ্রেণীর লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নীচের লোকেরা বলে বসে যে, যদি আমরা জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু করি, তবে আমরা আমাদের উপরের লোকদের কষ্ট দেয়া থেকে অব্যাহতি পাব। এখন যদি নিচের লোকদেরকে এ কাজ করতে দেয়া হয় এবং বাধা না দেয়া হয়, তবে বলাবাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে। আর তাতে নীচের

লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না’ । [সহীহ আল-বুখারীঃ ২৪৯৩]

এসব বর্ণনার ভিত্তিতে অনেক মুফাসসির মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, এ আয়াতে فتنة (ফিত্‌নাহ) বলতে এই পাপ অর্থাৎ সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান বর্জনকেই বোঝানো হয়েছে।

وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ ৮ : ২৬
النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

২৬. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, যমীনে তোমরা দুর্বল হিসেবে গণ্য হতে। তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে হঠাৎ এসে ধরে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, নিজের সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জিনিষগুলো জীবিকারূপে দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

এখানে শোকরগুজার শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ওপরের ধারাবাহিক বক্তব্যগুলো সামনে রাখলে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ মুসলমানদের দুর্বলতার অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন এবং মক্কার বিপদসংকুল জীবন থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে এমন শান্তি ও নিরাপত্তার ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যেখানে তারা উত্তম রিযিক লাভ করছে। শুধুমাত্র এতটুকু কথা মেনে নেয়াই শোকরগুজারী অর্থ প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সেই সাথে একথাও অনুধাবন করা শোকরগুজারীর অন্তর্ভুক্ত যে, যে মহান আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি এত সব অনুগ্রহ করেছেন সেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা তাদের কর্তব্য। আর রসূল যে আন্দোলনের সূচনা করেছেন, তাকে সফল করার সাধনায় তাদেরকে আন্তরিকতা ও উৎসর্গিত মনোভাব নিয়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ কাজে যেসব বাধা-বিপত্তি, বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেবে, আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তারা সাহসের সাথে তার মোকাবিলা করে যাবে। কারণ এ আল্লাহই ইতিপূর্বে বিপদ-আপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস-রাখবে, যখন তারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহর কাজ করবে, তখন আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের পক্ষ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করবেন-এসবই

শোকরগুজারীর অর্থে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই শুধুমাত্র মুখে স্বীকৃতি দান পর্যায়ের শোকরগুজারী এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং এ শোকরগুজারী বাস্তবে কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। অনুগ্রহের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও অনুগ্রহকারীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রচেষ্টা না চালানো, তার খিদমত করার ব্যাপারে আন্তরিক না হওয়া এবং না জানি আগামীতেও তিনি অনুগ্রহ করবেন কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা-এসব কোন ক্রমেই শোকরগুজারী নয় বরং উল্টো অকৃতজ্ঞতারই আলামত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ৮ : ২৭

২৭. হে ঈমানদারগণ! জেনে-বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খেয়ানত করো না

আল্লাহর আমানত বলতে অধিকাংশের মতে যাবতীয় ফরয কাজ বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলের আমানত বলতে তার সুন্নাত ও নির্দেশ বুঝানো হয়েছে। সে হিসাবে খেয়ানত হলো সেগুলো না মানা। [ফাতহুল কাদীর]

নিজেদের আমানত বলতে সে সব দায়িত্ব বুঝানো হয়েছে, যা কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করে তার উপর ন্যস্ত করা হয়। তা ওয়াদা পূরনের দায়িত্ব হতে পারে, সামগ্রিক সামাজিক চুক্তি হতে পারে, কোন সংস্থার আভ্যন্তরীণ গোপন তথ্য হতে পারে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদ হতে পারে। কারো প্রতি বিশ্বাস করে জনসমাজ যদি তাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে তবে তাও এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে। বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আন- নিসার ৫৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্ৰষ্টা। নিসাঃ৫৮

আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে, প্রথম অর্থ যা উপরে করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের আমানতসমূহেরও

খেয়ানত করো না। [তাবারী; ইবন কাসীর] দ্বিতীয় অর্থ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না কারণ এতে করে তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত আমানতেরই খেয়ানত করে বসবে। [তাবারী; বাগভী]

হাদীসে এসেছে যে, নবী (সাঃ) প্রায় খুতবায় এ কথাটি অবশ্যই বলতেন, ‘‘যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান নেই, যে চুক্তি রক্ষা করে না, তার দ্বীন নেই।’ ’ (আহমাদ)

আমানতদারী না থাকা মুনাফেকীর একটি আলামত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মুনাফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে। [বুখারী ৩৩; মুসলিম: ৫৯]

কুরআনুল কারীম আমানতের বিষয়টিকে أَمَانَات বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র আমানত নয়, যাকে সাধারণতঃ আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয়; বরং আমানতের আরো কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের (কাবা ঘরের চাবি উসমান ইবন তালহাকে দেয়া) শানে-নুযূল প্রসঙ্গে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহর চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহর খেদমতের একটা পদের নিদর্শন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ তা’আলার আমানত।

وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اَمۡوَالُكُمۡ وَ اَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنۡدَهٗۤ اَجۡرٌ عَظِيۡمٌ ۲۸ : ۸

২৮. আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরিক্ষা। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফেলতী ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণতঃ মানুষের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, “আর জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফেৎনা।” [সা’ দী] ‘ফেৎনা’ শব্দের অর্থ পরীক্ষাও

হয়; আবার আযাবও হয়। তাছাড়া এমন সববিষয়কেও ফেৎনা বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এই তিনটি অর্থেই ফেৎনা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুতঃ এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে।

যে জিনিসটি সাধারণত মানুষের ঈমানী চেতনায় এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং যে জন্য মানুষ প্রায়ই মুনাফেকী, বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানতে লিপ্ত হয় সেটি হচ্ছে, তার অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সন্তান-সন্ততির স্বার্থের প্রতি সীমাতিরিক্ত আগ্রহ। এ কারণে বলা হয়েছে, এ অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহে অন্ধ হয়ে তোমরা সাধারণত সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও। অথচ এগুলো তো আসলে দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহে তোমাদের জন্য পরীক্ষার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। যাকে তোমরা পুত্র বা কন্যা বলে জানো, প্রকৃতপক্ষে সে তো পরীক্ষার একটি বিষয়। আর যাকে তোমরা সম্পত্তি বা ব্যবসা বলে থাকে, সেও প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার আর একটি বিষয় মাত্র। এ জিনিসগুলো তোমাদের হাতে সোপর্দ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা অধিকার ও দায়-দায়িত্বের প্রতি কতদূর লক্ষ্য রেখে কাজ করো, দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে আবেগতাড়িত হয়েও কতদূর সত্য ও সঠিক পথে চলা অব্যাহত রাখো এবং পার্থিব বস্তুর প্রেমাসক্ত নফসকে কতদূর নিয়ন্ত্রণে রেখে পুরোপুরি আল্লাহর বান্দায় পরিণত হও এবং আল্লাহ তাদের যতটুকু অধিকার নির্ধারণ করেছেন ততটুকু আদায়ও করতে থাকো, এগুলোর মাধ্যমে তা যাচাই করে দেখা হবে।

আয়াতে আল্লাহ তাআলা অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে ‘ফিতনা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ইবনে কাসির রাহ. উক্ত আয়াতে ফিতনা শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেন, أي : اختبار وامتحان منه لكم অর্থাৎ “পরীক্ষা করা, যাচাই বা পরখ করা।”

মহান আল্লাহ তোমাদেরকে এগুলো দিয়েছেন যেন তিনি জানতে পারেন যে, তোমরা এসব পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর ও তার আনুগত্য কর না কি এগুলোতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার থেকে দূরে সরে পড়।” [তাফসিরে ইবনে কাসির]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

"আর আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দিয়ে পরীক্ষা করি।" [সূরা আম্বিয়া: ৩৫]

এ সব ক্ষেত্রে ফিতনা অর্থ: পরীক্ষা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এসব জিনিস দ্বারা বান্দাকে পরীক্ষা করতে চান। তারপর দেখতে চান, কারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় আর কারা ব্যর্থ হয়।

اِنَّمَاۤ اَمۡوَالُكُمۡ وَ اَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عِنۡدَهٗۤ اَجۡرٌ عَظِيۡمٌ ১৫ : ৬৪

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। তাগাবুনঃ ১৫

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এ পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার পরিচয় দিচ্ছে। দুনিয়া অর্থ-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান সহ সুখে জীবন-যাবন করার অভিপ্রায়ে হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম বানিয়ে ছেড়েছে! সুদ, ঘুস, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, অবৈধ পণ্যের ব্যবসা সব বিভিন্ন হারাম উপার্জনের পেছনে ছুড়ে বেড়াচ্ছে উদভ্রান্ত পাগলের মত! তাদের নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, জিকির, তাসবীহ, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন অধ্যয়ন করার সময় নাই!! সন্তানদের ক্যারিয়ার গঠনের চিন্তায় তাদেরকে দ্বীন শেখানোর কথা ভুলে গেছে!! এভাবে মানুষ এই পরীক্ষায় স্পষ্ট অকৃতকার্য হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে গেছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অথচ আল্লাহর বিধান মেনে অর্থ-সম্পদ কামানো, আয়-উন্নতি করার ব্যাপারে ইসলাম বাধা দেয়া না। তবে সম্পদের হক আদায় করতে হবে। যাকাত, সদকা, দ্বীনের কাজে সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা, গরীব-অসহায় মানুষের কল্যাণে অবদান রাখার মাধ্যমে সে এ সম্পদ দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিকে দিয়ে কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হত।

অনুরূপভাবে সন্তানদের উন্নত জীবন ও ক্যারিয়ার গঠনে ইসলাম বাধা দেয় না। কিন্তু তা করতে হবে আল্লাহর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে। দ্বীন থেকে দুরে সরে গিয়ে সন্তানদেরকে গড়ে তুললে এরাই তাদের পিতামাতাকে পদপিষ্ট করে জাহান্নামের

আগুনে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এ সন্তানরাই কিয়ামতের দিন তাদের গোমরাহির জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে দায়ী করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

"কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।" [সূরা ফুসসিলাত: ২৯]

পক্ষান্তরে এ সন্তানদেরকে দ্বীনের উপর গড়ে তুললে তাদের প্রাণখোলা দুআ ও চোখের পানি পিতামাতার গুনাহ মোচন ও জান্নাতে যাওয়ার কারণ হতে পারে যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা, এই সন্তান-সন্ততি এবং অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আমরা যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাই, তাহলে সর্তক হতে হবে যেন, এগুলো আমাদেরকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে না দেয় বরং এগুলোই যেন আমাদের জান্নাতে যাওয়ার কারণ হয়। আল্লাহ তাওফিক দান করুন। আমীন